*International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 32-37*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8**

# রবীন্দ্র সাহিত্যে বাউলদর্শন

**কাবেরী বসু**
*এম. এ., প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়*

***Abstract***

*The Bauls are devoted souls of the God who believes in the supreme power. Baul is the word of heart of the people which is realization of the absolute in living being. Humanity is the only religion for Baul who has no caste, no race, no violence, and no discrimination. Baul is born in the deep faith of Paramatman and humanity. Though they have religious symbols on the outside, their hearts are irreligious, casteless and raceless. They are servants of the eternal God. There are different ways of Dharmasadhana in the history of Indian Dharmasadhana. The first is Dharmashastra-based Dharma Sadhana then Baul of rural Bengal. There were presented of great aristocrats, authors and founders in Dharmashastra and baul. The contribution of Baul in the practice of sadhana in Bangladesh is undeniable. They always realize the eternal God, who is ultimate. The object of their love is the God of their hearts. They have a pure mind, they always believe in love. They are real God-lovers, they gain the God of the heart through love. The Bauls say that truth is the religion of the soul. So if you want to know the truth, you have to know it through your soul. We have seen the search for truth in various discussions of Rabindranath's literature. He has become a devotee like a devotee of Baul Sadhana in search of the truth. The presence of Baul melody in can be noticed in his literature. He has presented a unique Baul philosophy in his literature. I want to show in this paper how Rabindranath came in contact with Baul, how Baul influenced his literary works and how he was influenced by Baul. Above all, how did he praise the Baul Sadhana in search of truth? I would like to show that how the Baul Sadhana and Rabindranath's literary sadhana integrated each other and how the Baul philosophy nourished Rabindranath's literature.*

***Keywords: Baul, Sadhana, folk song, religion, humanism, eternal love, almighty***

**সূচনা**: বাউল হল সংসার-মোহ মুক্ত, উদাসীন, ঈশ্বর-পাগল ও পরমতত্ত্বে নিবেদিতপ্রাণ। বাউলিয়া মত আধুনিক নয়। এতো সেই আদিকাল থেকে পল্লী লোকের মনের কথা। ক্ষিতিমোহন সেন-এর মতে, ‘যতকাল মানব, ততকাল এই বাউল সহজিয়া মত।’ অর্থাৎ আদি অনন্ত এই বাউল সহজিয়া মত। বাউল সাধনার মর্মকথা হলো জীবসত্তায় নিত্য স্বরূপকে উপলব্ধি করা। এই নিত্য স্বরূপ ‘অধরা’। বাউলের একটাই ধর্ম তা হল মানবধর্ম। এর কোন বর্ণ নাই, জাতি নাই, নাই কোন হিংসা, নাই

কোন ভেদাভেদ। বাউল বহুধর্ম অস্বীকার করে, বাউল বর্ণহীন, জাতিহীন একমানব ধর্মে বিশ্বাসী। বাউলেরা সহজ সরল এদের একটিই জাতি তা হল বাউল জাতি। এরা মানব ধর্মের প্রেরণায় পরিচালিত। এরা প্রাণের সহজ ধর্মকে জীবনে স্বীকার করে। সহজ সরল বিশ্বাসে পরমাত্মা ও মানবতার মিলনে বাউল-মনের জন্ম। সংস্কার ও ধর্মবসত তাদের বহিরঙ্গে ধর্মীয় চিহ্ন থাকলেও তাদের মন ধর্মহীন, জাতিহীন ও বর্ণহীন। তারা সহজ সরল মানুষ মাত্র। তারা চিরন্তন ঈশ্বর প্রেমী ঈশ্বরের দাস। লালন ফকিরের ভাষায়

– "ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই।"

**অচেনা অজানা তথ্য সন্ধানে বাউলের প্রয়াস:** ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে ধর্মসাধনার বিভিন্ন ধারার প্রচলন আছে । ভারতীয় ধর্মসাধনায় আমাদের প্রথমেই স্মরণে আসে ধর্মশাস্ত্র আশ্রিত ধর্ম সাধনা। এই ধর্ম শাস্ত্রগুলির রচয়িতা ও স্থপয়িতাদের মধ্যে বড় বড় অভিজাত, বিদ্বান, পণ্ডিতজনেদের উপস্থিতি নেহাৎ কম নয় । এঁদের পরেই আসে পল্লী বাংলার বাউলদের কথা। বাংলাদেশের সাধনার চর্চায় বাউলদের অবদান অনস্বীকার্য । বাউল সাধকেরা বাংলাদেশের মর্মের কথা বলেছিলেন।

বহুশতাব্দী ধরে জাতিপংক্তির বহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্রভারমুক্ত মানবধর্মই সাধন করে এসেছে। তাঁরা মুক্তপুরুষ তাই সমাজের কোন বাঁধন মানেনি। তবে সমাজ তাঁদের ছাড়বে কেন? তখন তাঁরা বলেছে –'আমরা পাগল , আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোন দায়িত্ব নাই।' বাউল অর্থ বায়ুগ্রস্থ, অর্থাৎ পাগল। আর তাঁরা বলেন –'মনে করিও যেন আমরা সামাজিক হিসাবে মরিয়াই গেছি'। বহুশতাব্দী ধরে জাতিপংক্তির বহির্ভূত একদল নিরক্ষর পাগল সাধক শাস্ত্রভারমুক্ত মানবধর্মের সাধনায় মগ্ন থেকেছে, না আছে তাদের এই জাতি না আছে তাদের ধর্ম। তাঁরা বাধাহীন, সমাজ তাঁদের বাঁধতে পারেনি তাঁরা মুক্তপুরুষ । আত্মহারা এই পাগল এরা সমাজের রীতি-নীতির সম্মুখে এসে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে –'আমরা পাগল , আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোন দায়িত্ব নাই।' বাউল অর্থ বায়ুগ্রস্থ, অর্থাৎ পাগল। আর তাঁরা বলেন –'মনে করিও যেন আমরা সামাজিক হিসাবে মরিয়াই গেছি'। হিন্দু ও মুসলমানের বেশ ও ভাষার সাথে বাউলের বেশ ও ভাষার বহু মিল পাওয়া যায়। সম্প্রদায় বিশেষ- এর কেশ রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ ঐতিহ্য আছে। কেশ রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা অতি সহজেই সম্প্রদায়কে চেনা যায় । সেই জন্য বাউলেরা হিন্দু বা মুসলমান কোন নির্দিষ্ট ধর্মের কেশ তারা রক্ষণাবেক্ষণ করেন না বরং তারা সর্বধর্মের অনুসারী কেশ রক্ষণাবেক্ষণ করেন । দেহকে আচ্ছাদিত করেন নানা বস্ত্রখণ্ড দিয়ে। তবে তাদের বেশভূষার সাথে মুসলমানি ভাবের অনেক মিল পাওয়া যায়।

যখন প্রশ্ন করা হয় কত কালের পুরনো এই বাউল মত ও বাউলিয়া সাধনা, তখন বাউলেরা বলে- "আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল সহজ নিত্য মানব সত্যের উপরে । কাজেই যতকাল মানব, ততকাল এই সহজ বাউলিয়া মত। বেদ পথ তো সে দিনের। তাহাই তো কৃত্রিম। ঋষিরা সেইদিন তাহা রচনা করিয়াছেন।বাউলিয়া সহজ মতই অনাদি কালের। বেদের আদি আছে।" ধর্মসাধনার তিনটি পথ আছে, এর মধ্যে কর্ম ও জ্ঞান হল গৌণ পথ। কর্মে বাইরে বেশি যেতে হয়। জ্ঞান কর্মাপেক্ষা ভাল পথ, এটি কর্ম অপেক্ষা মানুষের বেশি অন্তরঙ্গ। তবে ধর্মসাধনার তিনটি পথের মধ্যে প্রেম মুখ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম পথ। প্রেমের আদি-অন্ত এই মানুষেই ।তবে এই প্রেম সাধনায় মানুষের তুল্য মহিমা আর কিছুতেই নেই।

বাউলেরা অন্তরের উপাস্য ভগবানকে সর্বদাই শ্রদ্ধা করে। তাদের উপাস্য ভগবানই হলো তাদের পরম গুরু। তাদের প্রেমের বস্তু তাদের অন্তরের ভগবান। যে ভগবান তাদের অন্তরে নেই, বাইরের জগতে বিরাজমান। তাকে তো কখনো আর জানা যাবেনা, লাভ করা যাবে না, ভগবানকে পেতে হলে অন্তরের ভগবানকেই পেতে হবে, আর এই মন প্রাণ দিয়ে অন্তরের ভগবানকে ভালবেসে যেতে হবে, তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, তাহলেই এই ভগবানকে জানতে পারবে। অন্তর শুদ্ধ না থাকলে সেখানে কখনো ভগবানের দেখা পাওয়া যায় না, সেই জন্যই তারা সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ, মিথ্যাচার মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাদের মন থাকে নির্মল তারা সর্বদাই মৈত্রীতে বিশ্বাসী। তারা হল প্রকৃত প্রেমিক। প্রেমের মাধ্যমে সমস্ত কিছুকে জয় করার দিকে এগিয়ে চলে এবং তারা প্রেমের মাধ্যমেই অন্তরের ভগবানকে লাভ করে।

বাউলরা বলেন সত্য পরিচয় অন্তরাত্মার ধর্ম। সত্যকে জানতে হলে অন্তরাত্মার মাধ্যমেই তাকে জানতে হবে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনোই সত্যের পরিচয় হয় না। ইন্দ্রিয় সর্বদাই মানুষকে বিভ্রান্ত করে, বিভ্রান্তি ছড়ানোর মূলে ইন্দ্রিয়। তাই সত্যকে জানার জন্য উপযুক্ত সাধনা করতে হবে, উপযুক্ত সাধনার মাধ্যমে সত্যকে জানা সম্ভব। 'বাণীকে চোখে দেখা' কথাটির

মর্মার্থ হল উপযুক্ত সাধনার মাধ্যমে সত্য-পরিচয় ঘটে তাই 'ন দদর্শ বাচম্"। এই বাক্যই বিশ্বদেবগণের সঙ্গে সারা বিশ্ব পূর্ণ করে বিরাজমান। দেব-নর বিশ্বের সকলের ক্ষেত্রেই এই বাক্যটি সত্য। সর্বশক্তির মূলই হল সত্য। আর সত্যই হল সর্বশক্তিমান।

পরমাত্মা, জীবাত্মা পরস্পর প্রেম সখা। একজন মুক্ত, অন্যটি বদ্ধ । দুই বিপরীত অবস্থানে থেকেও তারা বন্ধু, একই বৃক্ষে দুই পাখি অবস্থান করে। একজন ফল খায় অন্যজন সর্ব রসাস্বাদের অতীত। সহজভাবে বললে বলতে হয় যে, শূন্যতত্ত্ব, অনুরাগতত্ত্ব, সহজতত্ত্ব কায়াযোগ প্রভৃতি হল বাউলতত্ত্বের মূল বিষয়। বাউলেরা মনে করেন সহজই হল স্বাভাবিক। ঝড় উঠলে কতক্ষণ প্রকৃতি তা সহ্য করতে পারে? কাম হল কৃত্রিম তাই ক্ষণিক। সহজ শান্তিই শাশ্বত। সহজ নিষ্কামই শান্ত ও চিরন্তন। ভগবান সহজ তাই তাঁর শব্দ নেই, প্রকাশ নেই।

**বাউল সাধনায় রবীন্দ্রনাথ :** রবীন্দ্রনাথের বাউলপ্রীতির পরিচয় বিভিন্নভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। শিলাইদহ, পাতিসর, বোলপুরে থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাউলদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। অসংখ্য লোকগীতি তিনি এদের কণ্ঠে শুনেছিলেন। এদেরই একজন হলেন সর্বক্ষেপী। রবীন্দ্রনাথ 'বোষ্টমী' গল্পটি লিখেছিলেন শিলাইদহের এই পরিচিত ও জনপ্রিয় চরিত্রটিকে নিয়ে। বোষ্টমীর রূপায়ণে পরিচিত রূপটিকেই তিনি তুলে ধরেছেন – 'দেখিতে পাইলাম বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপসা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার মূর্তির মতো করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পুব দিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে'।

রবীন্দ্রনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই বাউলের গাথার সমালোচনা হিসেবে 'বাউলের গান' শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ১৮৮৩ সালে (১২৯০ বঙ্গাব্দ) রচিত এই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধটিই তাঁর প্রথম গুরুত্ব পূর্ণ রচনা। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর 'Philosophy of Our People' নামে তাঁর অভিভাষণে বাউলদের কথাই পড়েছিলেন। ১৯৩০ সালে এই দীনহীন সন্ত-বাউলদের মানবধর্মেরই বক্তৃতা দিয়েছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

**রবীন্দ্রসাহিত্যে বাউলের প্রকাশ :** লোকসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা লোকসংগীতের মধ্যে আধুনিক কালের ছোঁয়া লেগে অনেক কৃত্রিম, হালকা, কমদামী জিনিসের যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেই সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মহম্মদ মনসুর উদ্দিন-এর 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— "'সকল সাহিত্যে যেমন, লোকসাহিত্যেও তেমনি, তার ভালো মন্দের ভেদ আছে। কবির প্রতিভা থেকে রসধারা বয় মন্দাকিনীর মতো অলক্ষ্য লোক থেকে সে নেমে আসে'। তারপর একদল লোক আসে যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আনতে লেগে যায়। তারা মজুরী করে , তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, এর বিশুদ্ধতা চলে যায়, কৃত্রিমতার নানা প্রকারে বিকৃত হতে থাকে। অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলেগেছে, তা চলতি হাটের সস্তা দামের জিনিস হয়ে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেকস্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনা দ্বারা আকীর্ণ তার অনেকগুলই মৃত্যু ভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগী দলে টানবার প্রচারক গিরি।এর উপায় নেই খাঁটি জিনিসের পরিমান বেশি হওয়া অসম্ভব, খাঁটির জন্য অপেক্ষা করতে এবং তাকে গভীরভাবে চিনতে যে ধৈর্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এইজন্য কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চলতে থাকে। এইজন্যে সাধারনত যে সব বাউলের গান যেখানে সেখানে পাওয়া যায়, সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম কি বেশি নয়।"

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমান মিলনের সত্যরূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাউল সম্প্রদায়, বাউলের গান ও তার তত্ত্বভাবনার মধ্যে দিয়ে । তিনি তার এই অভিজ্ঞতাই 'হারামনি' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাউল গান ও বাউল তত্ত্বের প্রসঙ্গ ভারতবর্ষীয় দার্শনিক মহাসঙ্ঘের অভিভাষনে উপস্থাপিত করেছিলেন । তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাংলাদেশের নিরক্ষর, সরল কবি বাউলদের গানে সীমার ঊর্দ্ধে অসীমের অভিসার আকাঙ্ক্ষা । বিখ্যাত ইংরেজ কবি শেলির কাব্যে বর্ণিত সুন্দরের প্রতি অতীন্দ্রিয় আবেশের সঙ্গে বাউলের গানে ধ্বনিত আকাঙ্ক্ষার সাদৃশ্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

আসলে বাংলার লোক সংগীত রবীন্দ্রসংগীতের সুবিশাল ভাণ্ডারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। রবীন্দ্রনাথ লোকসংগীতের সুরে অসংখ্য গান রচনা করেছেন, এছাড়াও লোকসংগীতের বিভিন্ন বিভাগ যথা - বাউল, সারি, ঝুমুর, ভাটিয়ালি, আগমনীগান, গোষ্ঠগান প্রভৃতি তাঁর রচনায় প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করেছেন । তিনি বাংলা ইংরাজিতে বাউল গান ও বাউল তত্ত্ব নিয়ে একাধিকবার গুরুত্বপূর্ণ সব মনোভাব প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতিটি স্তরে বাউল

প্রভাব মিশে আছে। 'খেয়া' কাব্যের 'ঘাটে' কবিতায় 'বাউলের সুর' কথাটি কাব্য শিরনামের নীচে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। কবিতাটির আরম্ভ নিম্নরূপ –

'আমার নাই বা হল পারে যাওয়া
যে হাওয়াতে চলত তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।'

প্রকৃতপক্ষে লোক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাউলের সুর বলে কোন পৃথক সুরের অস্তিত্ব নেই। আঞ্চলিক বিশিষ্টতার দ্বারাই বাউলের গানগুলি চিহ্নিত হয়। বাউলের গান, কীর্তন, সারি, ভাটিয়ালি, ঝুমুর প্রভৃতি গানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যারা জনপ্রিয় বাউল তাদেরকে কেন্দ্র করে একটা বিশেষ রীতিতে বাউল গানগুলি গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার বাউল শিল্পীদের সাথে পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের বাউলদের সঙ্গে যেমন পরিচিত ছিলেন তেমনি তিনি শাজাদপুর, শিলাইদহ, পাতিসর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের অঞ্চলের বাউলদের সাথে পরিচিত ছিলেন। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের রচনায় 'বাউলের সুর' বলে উল্লেখ করেছেন তখন বুঝতে হবে যে এই মিশ্র সুরের কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।

'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থের 'বাউল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বাংলার বাউলের সরল রূপচিত্রটিকে অঙ্কিত করেছেন –

'পুঁতির কণ্ঠীখানি গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছ? সামনের আঙিনাতে'

আবার 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র ভঙ্গিতে বাউলের উপমা ব্যাবহার করেছেন –

'ওই গাছগুলো বিশ্ব বাউলের একতার, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন।'

'শেষসপ্তক' -র ১৩ সংখ্যক কবিতায় বাউল এবং বিখ্যাত বাউলগানের সুপরিচিত এক পঙক্তি – 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়'— এর অনুষঙ্গে সুগভীর দার্শনিক ভাবনার প্রবেশ দেখা যায়।–

'রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল "অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়"
দেখে অবুঝ মন বলে
অধরাকে ধরেছি'

রবীন্দ্রনাথ তার নাটকে যেভাবে বাউল গানকে ব্যবহার করেছেন তা লক্ষণীয় – 'গোড়ায় গলদ' নাটকের একেবারে সমাপ্তিতে একটি সমবেত কণ্ঠের গান রয়েছে, গানের সুর নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

'বাউল সুর', —

'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো।
কেই বা অতি জ্বল জ্বল, কেউ বা ম্লান ছল ছল
কেউ বা কিছু দহন করে কেউ বা স্নিগ্ধ আলো।'

'গৃহ প্রবেশ' নাটকে যতীন তার বোন হিমিকে একটা বাউল গান শোনায়। সে বলে '...অনেকদিন পরে আমাদের কিনু বাউলের সেই গানটা আমার মনে পড়েছে।' এরপর যতীন গান গায় –

'ওরে মন যখন জাগালি না রে-
তখন মনের মানুষ এক দ্বারে
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।'...

বাউলের 'মনের মানুষ'—এর প্রত্যক্ষ উল্লেখটি এখানে লক্ষনীয়।

'শারদোৎসব' 'শেষরক্ষা', নাটকেও বাউল সুরের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস এবং ছোটগল্পেও বাউল সুর ব্যবহার করেছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসের সূচনাতে একটি সুবিখ্যাত বাউল গানের দু'টি পঙক্তি ব্যবহৃত হয়েছে – 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়,

ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।'

আবার, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে কোন এক লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে চাটগাঁর কাছে কীর্তনে মেতে করতাল বাজিয়ে শচীশের পাড়া অস্থির করে নেচে বেড়ানোর প্রসঙ্গে বাউল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

'গৃহপ্রবেশ' নাটকটির গল্পরূপ হল 'শেষের রাত্রি'। এখানে যতীনের কণ্ঠে বাউল গানটি গীত হতে শুনি – 'ওরে মন, যখন জাগলি না রে।'

বাংলায় লোকসংগীতের আসল ভাণ্ডারী হল আউল, বাউল, বোষ্টমীরা। রবীন্দ্রনাথের সাথে এদের ঘনিষ্ট পরিচয় গড়ে উঠেছিল যখন তিনি শিলাইদহে ছিলেন। এই সময়েই তিনি এদের কণ্ঠে অসংখ্য লোকগীতি শুনেছিলেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বাউল দর্শনের প্রেমে পরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যেও লোকসংগীতের বিবিধ উল্লেখ আছে। তিনি বাংলা ইংরেজিতে বাউল গান ও বাউল সাধন তত্ত্ব সম্পর্কে বহু প্রবন্ধাদি লিখেছেন যেগুলোর মূল্য অপরিসীম। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' পর্যায়ে স্ব-সৃষ্ট একটি গানের সঙ্গে একটি সুপরিচিত বাউল গানের ভাবৈক্য লক্ষ্য করে তিনি লিখেছেন – "স্বর গুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম, 'আমি চিনি গো চিনি, তোমারে, ওগো বিদেশিনী' – সঙ্গে সঙ্গে যদি সবটুকু না থাকিত তবে এ গানের কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না।কিন্তু ওই সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি মনে জাগাইয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন বিদেশিনী আনাগোনা করে, কোন রহস্য সিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি, তাহাকেই শারদ প্রাতে মাধবী রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই, হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমর গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি –

'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে।
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।'

ইহার অনেকদিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তাদিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল – 'খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়'।

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়, মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।"

এছারাও 'মানুষের ধর্ম', 'সাহিত্য তত্ত্ব', 'ছোট ও বড়ো', 'বিহারীলাল' ইত্যাদি প্রবন্ধে পরিচিত বাউল গানের মধ্যে দিয়ে কবি মানুষের অন্তরের গভীর কথাটিকেই বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাউলের ভাবধারা সর্বদাই রবীন্দ্রনাথের অন্তরসত্তায় সুপ্ত ছিল। এই জন্যই তিনি বারে বারে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বাউল সম্প্রদায়ের সারবত্তাকে পরিস্ফুট করেছেন। তাই বহুকাল পূর্বে এক বৈরাগীর মুখে শোনা গান – 'আমি কোথায় পাব তারে

আমার মনের মানুষ যে
আমার মনের মানুষ যেখানে
আমি কোন সন্ধানে যাইব সেখানে।'

বাউলভাব রবীন্দ্রনাথের মনে আজীবন ঘুরে বেরিয়েছে। তিনি এই গানটির খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যাও করেছেন – মানুষের মনের মানুষ তিনিই তো, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠেছে। মানুষ আপনার সবকিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি— কাকে অনুভব করেছে। সেইজন্য এই বাউলের দলই বলেছে—

খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি
কমনে আসে যায়,

অচেনাকে চেনার নেশা, সীমার মাঝে অসীমকে জানার আগ্রহ ও অসীমকে আপন করার জন্যই প্রাণের ব্যাকুলতা!-

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে," -

এই প্রশ্ন চিরকালের প্রশ্ন। অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট দেশে আন্দোলিত যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষন করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলটুকু রয়ে গেছে।

**উপসংহার:**

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,-
'তিনি লালনের আছে যার মনের মানুষ সে মনে' -
এই গানে উল্লিখিত মনের মানুষ কে তা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি কবিতা ও রচনা করেন -

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তার সকলখানে।"

যুগে যুগে দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই মানুষ তার মনের মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছে। আপনার মনের মানুষের সন্ধান করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এই মনের মানুষের অবিরাম সন্ধানই তাকে কাছে পেতে সাহায্য করে তাকে যতই কাছে পায় ততই বলে, 'আমি কোথায় পাব তারে?' সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই, পাওয়ার মধ্যেও না পাওয়ার হতাশা। না পাওয়ার নিত্যটানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্য লাভ, জ্ঞানের বিস্তৃতি, কর্মক্ষেত্রের প্রসার - এক কথায় পূর্ণতার মধ্যে অবিরত নিজেকে নব নব রূপে উপলব্ধি।

**প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ:**

১. সেন, শ্রীক্ষীতিমোহন, বাংলার বাউল, কলকাতাঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।
২.হক, খোন্দকার রিয়াজুল, (সম্পাদনা), লালন সাহিত্য ও দর্শন, ঢাকাঃ মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ), ১৯৭৬।
৩। মিত্র, সনৎকুমার, (সম্পাদনা), বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ,-পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৫।
৪. দেব, চিত্তরঞ্জন, বাংলার পল্লীগীতি, কলকাতা: পূরবী দেব, ১৯৬৬।
৫. মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশে লোক সংস্কৃতি সন্ধান, ঢাকা: বংলা একাডেমী, ১৯৮২।
৬। রায়,শম্পা, "রবীন্দ্র প্রবন্ধ সাহিত্যে হিন্দুমুসলমান" সাহিত্য ও সংস্কৃত (সম্পাদনাঃ সঞ্জীব কুমার বসু),রবীন্দ্র সার্ধ-শতবার্ষিকী সঙ্কলন.১৪১৬,পৃ.১৩-২৭।
৭. ইসলাম, আমিনুল, "রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্মভাবনার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য" সাহিত্য ও সংস্কৃত(সম্পাদনাঃ সঞ্জীব কুমার বসু), রবীন্দ্র সার্ধ-শতবার্ষিকী সঙ্কলন, ১৪১৬,পৃ.৪৪-৭০।